নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

কৃষক ও কৃষি

ঋণের বোঝা নামলে কৃষকের হাতে ফিরবে স্বপ্ন : কৃষকের স্বস্তিই হোক অর্থনীতির শক্তি

১৪ লাখের বেশি কৃষকের ঋণমুক্তি শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করারও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

শাহারিয়ার আহম্মেদ রায়হান প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ৪ মিনিট পাঠ



বাংলাদেশের অর্থনীতির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক রক্তের মতোই গভীর। মাঠে কৃষকের ঘাম ঝরে বলেই আমাদের খাদ্যভান্ডার সমৃদ্ধ হয়, বাজার সচল থাকে, গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল হয়। অথচ সেই কৃষকই যখন উৎপাদন ব্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলের ন্যায্যমূল্যের অনিশ্চয়তা কিংবা বাজারের নানা প্রতিকূলতার কারণে ঋণের জালে আটকে পড়েন, তখন শুধু একটি পরিবার নয়—সমগ্র কৃষি অর্থনীতিই ঝুঁকির মুখে পড়ে। এই বাস্তবতায় ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণমুক্তির উদ্যোগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মানবিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে

পারে। ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণগ্রহণকারী ১৪ লাখ ৩৪ হাজার ৪৮২ জন কৃষকের ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকগুলোর প্রাপ্য ১ হাজার ৩৫২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা সরকার পরিশোধ করেছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো-দেশের সব উপজেলার কৃষক এই সুবিধার আওতায় এসেছেন। সংখ্যার বিচারে এটি একটি বড় কর্মসূচি। কিন্তু এর প্রকৃত গুরুত্ব বোঝার জন্য সংখ্যার বাইরে কৃষকের জীবনের দিকে তাকাতে হবে। একজন প্রান্তিক কৃষকের কাছে ১০ হাজার টাকা হয়তো কাগজে একটি ছোট ঋণ। কিন্তু সেই ঋণের সঙ্গে যুক্ত থাকে সুদ, সময়মতো পরিশোধের চাপ এবং পরবর্তী মৌসুমে নতুন করে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে একটি ছোট ঋণই ধীরে ধীরে বড় আর্থিক চাপ তৈরি করে। ফলে ঋণমুক্তির অর্থ হলো শুধু একটি হিসাবের খাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়। নির্দ্বিধায় বলা যায় এটা একজন কৃষকের সামনে নতুন করে পথ চলার সুযোগ তৈরি হওয়া। তবে কৃষির বাস্তবতা অত্যন্ত অনিশ্চিত। কৃষক বীজ বোনেন, সার দেন, সেচ দেন, শ্রম দেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফসলের দাম তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো খরা, বন্যা কিংবা রোগবালাই; আবার কখনো বাজারে দাম পড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচই ওঠে না। এই ঝুঁকির মধ্যেই কৃষককে পরবর্তী মৌসুমের প্রস্তুতি নিতে হয়। এমন অবস্থায় পুরোনো ঋণ মওকুফ একজন কৃষকের জন্য নতুন মৌসুমে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি করতে পারে। ঋণ পরিশোধের চিন্তায় যে অর্থ আটকে থাকত, তা কৃষি উপকরণ কেনা, পরিবারের প্রয়োজন মেটানো কিংবা নতুন করে উৎপাদনে বিনিয়োগে কাজে লাগতে পারে। অর্থাৎ এই উদ্যোগের সুফল কেবল ঋণগ্রহীতা কৃষকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। একজন কৃষক স্বস্তি পেলে স্থানীয় বীজ ও সার ব্যবসায়ী, শ্রমিক, পরিবহনকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-সবাই কোনো না কোনোভাবে এর ইতিবাচক প্রভাব পেতে পারেন। কৃষকের হাতে অর্থের প্রবাহ বাড়লে গ্রামীণ বাজারও সচল হয়। তবে ঋণমুক্তির এই উদ্যোগকে স্থায়ী সমাধান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি বরং কৃষককে ঘুরে দাঁড়ানোর একটি সুযোগ। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে কৃষকের আয় বাড়ানোর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। কৃষক যেন উৎপাদন করেই ন্যায্য দাম পান, সেটি নিশ্চিত করা সবচেয়ে জরুরি। একই সঙ্গে সহজ শর্তে কৃষিঋণ, সময়মতো কৃষি উপকরণ সরবরাহ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফসল সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে ভোক্তার বাজারের দূরত্ব কমানো প্রয়োজন। মধ্যস্বত্বভোগীর অযাচিত দৌরাত্ম্য কমিয়ে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে কার্যকর বাজারব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে কৃষকের আয় বাড়বে। আর আয় বাড়লে কৃষকের ঋণনির্ভরতা স্বাভাবিকভাবেই কমবে। আবার অন্যদিকে

কৃষকের জন্য ব্যাংকঋণকে শুধু সংকট মোকাবিলার উপায় হিসেবে দেখলে চলবে না। এটিকে উৎপাদন বৃদ্ধির বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য ঋণপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ, স্বচ্ছ ও বাস্তবসম্মত করা দরকার। কৃষকের কাগজপত্রের জটিলতা কমানো, সময়মতো ঋণ বিতরণ এবং কৃষির মৌসুম ভিত্তিক পরিশোধ ব্যবস্থা চালু রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

একই সঙ্গে কৃষকের আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শও জরুরি। কোন ফসলে বিনিয়োগ লাভজনক, কিভাবে উৎপাদন খরচ কমানো যায়, কোথায় পণ্য বিক্রি করলে ভালো দাম পাওয়া সম্ভব-এসব বিষয়ে কৃষককে তথ্য দিতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষি তথ্য সহজে কৃষকের হাতে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো দেশের সব উপজেলার কৃষক এর আওতায় আসবে। দেশের কৃষি অঞ্চলভেদে ভিন্ন হলেও কৃষকের আর্থিক সংকটের চরিত্র অনেকটাই অভিন্ন। তাই জাতীয় পর্যায়ে এমন উদ্যোগের বিস্তৃতি কৃষকের প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার একটি ইতিবাচক বার্তা দেয়। তবে যেকোনো সহায়তা কর্মসূচির মতো এখানেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক যেন সুবিধা পান, কোনো যোগ্য কৃষক যেন বাদ না পড়েন এবং সুবিধার অপব্যবহার যেন না হয়-এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে কার্যকর নজরদারি প্রয়োজন। আর কৃষককে সহায়তা করা মানে শুধু একজন ঋণগ্রহীতাকে স্বস্তি দেওয়া নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, গ্রামীণ বাজার এবং সামগ্রিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা। তাই বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ১৪ লাখের বেশি কৃষকের ঋণমুক্তির উদ্যোগকে একটি স্বস্তির খবর হিসেবে দেখার পাশাপাশি এটিকে আরও বড় কৃষি সংস্কারের সূচনা হিসেবেও দেখা প্রয়োজন। আজ ঋণের বোঝা কমবে, আগামীকাল উৎপাদন বাড়বে-এই ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে কৃষকের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত নীতি। একজন কৃষক যখন ঋণের দুশ্চিন্তার পেছনে ফেলে নতুন করে মাঠে নামেন, তখন তাঁর সঙ্গে মাঠে নামে একটি পরিবারের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত থাকে গ্রামের অর্থনীতি, দেশের খাদ্যনিরাপত্তা এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। তাই বলবো- কৃষকের কাঁধ থেকে ঋণের বোঝা নামানো শুধুমাত্র একটি আর্থিক সিদ্ধান্ত নয়—এটি কৃষকের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ। আর কৃষকের আত্মবিশ্বাস যত বাড়বে, ততই শক্তিশালী হবে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি। কৃষকের স্বস্তি মানেই দেশের স্বস্তি। কৃষকের সমৃদ্ধিই হোক বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শক্তি।